।। রবীন্দ্রসঙ্গীতে হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রভাব ।।

রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক আবহাওয়া সঙ্গীতমুখর ছিল এবং এই আবহাওয়া ও পরিবেশ রবীন্দ্রনাথকে সহজেই সঙ্গীতমুখী করিয়া তুলিয়াছিল। কলাবন্ত

ধ্রুপদ গায়কগণ বালক রবীন্দ্রনাথের মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে কবি নিজেই বলিয়াছেন—"তম্বুরার তারে সুর বেঁধে আলাপের ভূমিকা নিয়ে যখন বড়ো বড়ো গীত রচয়িতার ধ্রুপদ গানে গায়ক নিস্তব্ধ সভা মুখরিত করতেন, সেই ছবির সুগম্ভীর রূপ আজও আমার মনে উজ্জ্বল আছে।"

উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী সঙ্গীত হইতে গুরুদেব কিভাবে উপকৃত হইয়াছিলেন সে বিষয়ে গুরুদেব লিখিত মূল্যবান উক্তিগুলি পাই। তিনি বলিয়াছেন—

"জনশ্রুতি আছে যে, আমি হিন্দুস্থানী গান জানি নে, বুঝি নে। আমার আদি যুগের রচিত গানে হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ পদ্ধতির রাগরাগিণীর সাক্ষীদল অতি বিশুদ্ধ প্রমাণসহ দূর ভাবী শতাব্দীর প্রত্নতাত্ত্বিকদের নিদারুণ বাগবিতণ্ডার জন্য অপেক্ষা করে আছে। ইচ্ছা করলেও সেই সঙ্গীতকে আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারি নে, সেই সঙ্গীত থেকেই আমি প্রেরণা লাভ করি একথা যারা জানে না তারাই হিন্দুস্থানী সঙ্গীত জানে না।"

হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ গানের প্রতি রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবেই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এ বিষয়ে আর একটি উক্তি অনুধাবনযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—আমরা বাল্যকালে ধ্রুপদ গান শুনতে অভ্যস্ত, তার আভিজাত্য বৃহৎ সীমার মধ্যে আপন মর্যাদা রক্ষা করে। এই ধ্রুপদ গানে আমরা দুটো জিনিষ পেয়েছি—একদিকে তার বিপুল গভীরতা; আর একদিকে তার আত্মদমন, সুসংগতির মধ্যে আপন ওজন রক্ষা করা।" তবে স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ কখনই নিছক অনুকরণ-কারী হইতে পারেন নাই। তিনি চাহিয়াছিলেন—"এই ধ্রুপদের সৃষ্টি আগেকার চেয়ে আরো বিস্তীর্ণ হোক, আরো বহুকক্ষবিশিষ্ট হোক, তার ভিত্তিসীমার মধ্যে বহুবৈচিত্র্য ঘটুক, তাহলে সঙ্গীতে আমাদের প্রতিভা বিশ্ববিজয়ী হবে।"

বস্তুত ধ্রুপদ গানের সুগম্ভীর রূপ রবীন্দ্রনাথের ভাবঘন ব্রহ্মসঙ্গীত রচনার উৎস হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের অনেকেই

হিন্দুস্থানী ধ্রুপদের আদর্শে বাংলা ধ্রুপদ গান রচনা করেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—(যদু ভট্ট, বিষ্ণু প্রভৃতির) গান ভাঙিয়া তখন আমি এবং বড়দাদা (দ্বিজেন্দ্রনাথ) অনেক ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিয়াছিলাম। এইরূপে ব্রহ্মসঙ্গীতে অনেক বড় বড় ওস্তাদী সুর ও তাল প্রবেশ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথও তাঁহার অগ্রজগণের পন্থা অবলম্বন করেন। হিন্দুস্থানী ধ্রুপদের আদর্শে তিনি বাংলা ব্রহ্মসঙ্গীতে রচনা করিতে থাকেন। "ঝমঝুম বরখে আজু বাদরবা পিয়া বিদেশ মোরি" কাফী ঝাঁপতালে রচিত হিন্দীগানের আদর্শে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন—"শূন্য হাতে ফিরি হে নাথ পথে পথে।"

সৃষ্টি বৈচিত্র্যের তাগিদেই রবীন্দ্রসঙ্গীতে হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের ক্ষেত্রে, গৃহীত মৌলিক বিষয়গুলি কথা সুর তাল ইত্যাদি সমপ্রতিদ্বন্দ্বী। এইজন্য হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে যাহাকে ধ্রুপদ বলা হয় রবীন্দ্রসঙ্গীতে তাহার পূর্ণ রূপ নাই। অতএব বর্তমানকালে রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ রবীন্দ্রনাথের এই সকল গানকে ধ্রুপদাঙ্গ আখ্যা দিয়া থাকেন। হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ পরিবেশনে যেমন দ্বিগুণ, তিগুণ, চৌগুণ প্রভৃতি লয়কারী প্রদর্শনের কৌশল থাকে রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদাঙ্গ গানে তাহা অনুপস্থিত। কারণ তান বাটের কৌশলে গানের পদ ভাঙচুর হইয়া অর্থের অস্পষ্টতা সৃষ্টি করে এবং তাহার ফলে গানের ভাব খর্ব হইয়া পড়ে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য হইল কথা ও সুরের অর্ধনারীশ্বর সম্পর্ক। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ধ্রুপদ গানের বিষয়বস্তু সাধারণত ভগবদবিষয়, প্রকৃতিবর্ণনা, রাজবন্দনা ও রাগবর্ণনা। রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদাঙ্গ গান অধিকাংশ ভগবদবিষয়ক পূজা পর্যায়ের অন্তর্গত।

হিন্দুস্থানী ধ্রুপদে গানের অবয়বে চারিটি কলি থাকে। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ধ্রুপদাঙ্গ গানে এই চারিটি কলি—স্থায়ী, অন্তরা সঞ্চারী ও আভোগ দেখা যায়। ইহা বিশেষভাবেই ধ্রুপদের প্রভাব। ধ্রুপদ সঙ্গীত ভারতের সুপ্রাচীন আত্মসাধনার গভীর প্রেরণা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিল। উপনিষদের

শিক্ষার আবাহনে শিক্ষিত রবীন্দ্রনাথের চিত্ত এই কারণেই খেয়ালী গানের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। পারিবারিক পরিবেশও এই আকর্ষণ বৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছিল। ধ্রুপদের তুলনায় রবীন্দ্রসঙ্গীতে খেয়ালের প্রভাব খুবই কম। প্রাচীন ভারতের সুসমঞ্জস ও সুসংবদ্ধ সঙ্গীতচিন্তা ধ্রুপদ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে প্রতিফলিত। তাহার পর খেয়ালের যুগে চিন্তাধারা ভিন্ন ভিন্ন দিকে মোড় নেয়, ফলে গানের কথার গুরুত্ব কমিয়া গিয়া সুর তথা রাগ অধিকতর প্রাধান্য লাভ করিতে থাকে। গান তাহার অবয়বের বহির্ভূত বহু অলঙ্করণে সজ্জিত হইতে থাকে এবং খেয়াল ক্রমশঃ সুরপ্রধান গানরূপে প্রসার লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ কিছু সংখ্যক খেয়াল গানের আদর্শে গান রচনা করিয়াছেন। ধ্রুপদাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীতের মতো খেয়ালাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীতেও রচয়িতার স্বকীয়তার ছাপ বিদ্যমান। যেমন একটি খেয়াল গান—

[মিঞামল্লার। ত্রিতাল (মধ্যলয়)]

বোল রে পপৈয়রা অব ঘন গরজে, উন উন কর আই বদরিয়া
বরসন লাগি সদারঙ্গীলে, সৈঁয়দ না দামিনি কৌঁদি চৌঁদি
মোরা জিয়রা লরজে ॥

এই গানটির আদর্শে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন এই বিখ্যাত বর্ষাসঙ্গীতটি—

কোথা যে উধাও হল মোর প্রাণ উদাসী আজি ভরা বাদরে ॥
ঘন ঘন গুরু গুরু গরজিছে, ঝরো ঝরো নামে দিকে দিগন্তে জলধারা—
মন ছুটে শূন্যে শূন্যে অনন্তে অশান্ত বাতাসে ॥

সুসংগতির ওজন রক্ষা করাকে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত রচনা ও পরিবেশনের আদর্শরূপে গ্রহণ করায় তাঁহার খেয়ালাঙ্গ গানেও অলঙ্কার বাহুল্য বা অনাবশ্যক তান কর্তবের বা চতুর লয়কারীর প্রয়োগ নাই। খেয়ালাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীতে কেন তান বোলতান পরিহার করে তাহার কারণ ব্যাখ্যা করিয়া কবি নিজেই বলিয়াছেন—"ছেলেবেলা থেকে গানের প্রতি আমার নিবিড় ভালোবাসা যখন আপনাকে ব্যক্ত করতে গেল, তখন অবিমিশ্র সঙ্গীতের রূপ সে রচনা করলে

না, সঙ্গীতকে কাব্যের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে কোনটা বড়ো কোনটা ছোট বোঝা গেল না।...সঙ্গীতে দুই ভাবের প্রকাশ। এক হচ্ছে বিশুদ্ধ সঙ্গীতের আকারে, আর হচ্ছে কাব্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে। ভেদ অনুসারে সঙ্গীতের দুই রকমের অভিব্যক্তি হয়। তার প্রমাণ দেখা যায় হিন্দুস্থানে ও বাংলাদেশে। কোন সন্দেহ নেই যে বাংলা দেশে সঙ্গীত কবিতার অনুচর না হোক, সহায়ক বটে। কিন্তু পশ্চিম হিন্দুস্থানে সে স্বরাজে প্রতিষ্ঠিত। বাণী তার ছায়েবানুগতা।"

'জাগো মোহন প্যারে—ভৈরব রাগের এই গানটির আদর্শে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন—'মন জাগো মঙ্গললোকে অমল অমৃতময় নব আলোকে।' হিন্দুস্থানী গানটির বেলায় খেয়াল গায়ক কথার অংশকে নানা স্বর-বিন্যাস, বোলতানের সাহায্যে নানাভাবে ভৈরব রাগকে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানটির বেলায় তাহা করা যায় না। কারণ গানটির কাব্যাংশ ভৈরব রাগের সুরের সহিত মিলিত হইয়া প্রত্যুষের একটা বিশ্বজাগতিক ভাব অন্তরালে প্রকাশ করিতেছে। তানকর্তবের যোগে এই অখণ্ড ভাব বিনষ্ট হইয়া যায়। তবে যেখানে ভাবের জন্য প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন সেখানে খেয়ালাঙ্গ (এবং অন্যান্য গানেও) গানের সুরের কাঠামোতেই কবি তান ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন 'কার বাঁশী নিশিভোরে বাজিল' গানটির স্থায়ীর 'ফুটে দিগন্তে অরুণকিরণ-কলিকা' অংশের 'কলিকা' শব্দটিতে যে তান প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা নিবিষ্ট মনোযোগ সহকারে শুনিলে বুঝা যাইবে শরতের মধুর প্রাতঃকালে অরুণকিরণচ্ছটার দিগন্তে বিচ্ছুরিত হওয়ার ভাব আশ্চর্যরূপে অভিব্যক্ত করিয়াছে। পূজা ও প্রকৃতি পর্যায় ব্যতীত অন্যান্য পর্যায়ের খেয়ালাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীতের সন্ধান পাওয়া যায় না। হিন্দুস্থানী খেয়ালের মতই রবীন্দ্রনাথের খেয়ালাঙ্গ গান স্থায়ী ও অন্তরা এই দুই কলিযুক্ত।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে টপ্পার প্রভাব অপেক্ষাকৃত সীমিত। মূল টপ্পা গানের আদর্শে রবীন্দ্রনাথ অল্প কয়েকটি গান রচনা করিয়াছেন। টপ্পায় যে বিশেষ ধরণের

অলঙ্করণ বহুলভাবে প্রয়োগ করা হয় তাহাকে বলা হয় 'জম্‌জমা'। ধ্রুপদ ও খেয়ালের তুলনায় টপ্পা অপেক্ষাকৃত লঘু শ্রেণীর গান। তাহার জন্য কতকগুলি রাগ ও তাল নির্দিষ্ট আছে। ফলে মূল টপ্পাগুলি মুখ্যত মধুর রসেরই উপস্থাপনা করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের টপ্পা-অঙ্গের গানগুলি সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। জমজমা অলঙ্করণের বাহুল্যের ফলে গানের কথাগুলি ব্যক্ত হইবার সুযোগ পায় না—বস্তুত চাপা-ই পড়িয়া যায়। কাফী রাগের এই টপ্পা গানটি উল্লেখ করা যায়— হোমীয়া জানেবালে তান্থ অল্লাদি কসম ফিরিয়া লেন্থবালে ॥

আঁদা জাঁদা তুসী মনলে জাঁদে আবো সজন ঘরে
শরশা লগদা হো মতবালে ॥

এই গানটির আদর্শে রবীন্দ্রনাথ রচনা করিয়াছেন—

এ পরবাসে রবে কে হায় !
কে রবে এ সংশয়ে সন্তাপে শোকে ॥

একটি মূল টপ্পার আদর্শে গানটি রচিত। ইহা ছাড়াও টপ্পার অলঙ্করণ প্রয়োগ হইয়াছে এমন বিশেষ বিশেষ রবীন্দ্রসঙ্গীতও আছে। যেমন—

'সার্থক জনম আমার', 'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না',
'ও চাঁদ চোখের জলের লাগল জোয়ার' ইত্যাদি।

ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ছাড়া রবীন্দ্রসঙ্গীতে হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের অন্যান্য শ্রেণীর গানের প্রভাব তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।